চ্যালারাম

(গল্পগ্রন্থ – অনুসন্ধান)

দিল্লির এক পার্কে চ্যালারামের সঙ্গে আমার আলাপ হয়।

ভীষণ জোয়ান, পুরো ছ-ফুট ছ-ইঞ্চি লম্বা—হাতের কব্জি এই মোটা, এই গোঁফদাড়ি, এই বুকের ছাতি। কথায়কথায় জানতে দেরি হল না যে চ্যালারাম একজন অসাধারণলোক। তার মুখের ভাব এমনি যে দেখলে মনে হয়, জীবনেরঅনেকখানি সে দেখেচে। এমন ব্যাপার ঘটেচে এর জীবনে, যা সচরাচর মানুষের জীবনে ঘটতে দেখা যায় না।

তার ওপর মুশকিল হয়েচে আমরা বাঙালি, আমাদেরজীবনে অভিজ্ঞতার ক্ষেত্র এত সঙ্কীর্ণ। তবুও অমৃতসরে, দিল্লিতে, করাচিতে, ডেরাগাজিখাঁতে যারা জন্মায়—তারা অনেক কিছু দেখে, অনেক কিছু করে। আমরা যারা খুব কিছু করি, বাপের পয়সার খই ছড়াতে ছড়াতে বিলেতে গিয়ে উঠি।আমাদের চেয়ে মাদ্রাজী, তেলেগু, নোয়াখালি ও চাটগাঁয়েরমুসলমানেরা ভালো—তারা তবুও পাঁচটা দেশ দেখে, জাহাজের খালাসি-টালাসি হয়, যা হোক তবুও কিছু।

চ্যালারাম আমার কৌতূহল আকৃষ্ট করবে বেশি কথানয়, যখন সে প্রথমেই বললে সে ফ্রান্সে গিয়েছিল যুদ্ধের সময়, যুদ্ধ শেষ হবার পরে সে আবার একটা কিসে ভর্তি হয়ে মেসোপটেমিয়ায় যায়। মরুভূমিতে আরবদের হাতেপড়েছিল, টাইগ্রিসে নৌকোর বাচ খেলে এসেছে। বেবিলনেরধ্বংসস্তূপের মধ্যে বসে চুরোট খেয়েচে।

আমি বললুম—তোমার জীবনে সকলের চেয়ে একটাবড় ঘটনার কথা বলো না শুনি।

চ্যালারাম বলতে আরম্ভ করলে—

অমৃতসর জেলায় আমার বাড়ি। আমাদের গ্রামে সবাইএমন গরিব যে একজন একুশ টাকা মাইনে পেতে কলকাতায় কি কাজ করে—গ্রামের মধ্যে সেই ছিল বড়লোক ও বড়চাকরে। সে বলতো কলকাতায় সে পুলিশের দারোগা।

আমার স্বভাব ছিল দুঁদে ও নির্ভীক। আঠারো বছর বয়সে স্কুল ছেড়ে দিয়ে কিছু টাকা যোগাড় করে কলকাতায় এলাম।ভাবলাম, পুলিশের দারোগা যদি হঠাৎ না হতে পারি, হেডকনস্টেবল হওয়া কে আটকাবে ?

কলকাতা এসেই ভুল ভেঙে গেল। গ্রামের সেই লোকটাকে খুঁজে বার করে দেখলাম সে এক বড়লোকের বাড়ির দারোয়ান। সে আমার কলকাতায় থাকবার একমাসেরখরচ দিতে চাইলে, যদি গাঁয়ে ফিরে কাউকে তার দরোয়ানি করার কথাটা বলে না বেড়াই। তারই পরামর্শে মোটরগাড়ির কাজ শিখলাম। কিছুদিন কলকাতায় মোটর চালাবার পরেইউরোপের মহাযুদ্ধ বাধলো। আমি সৈন্যদলে ভর্তি হয়ে করাচি ও সেখান থেকে গেলুম ফ্রান্সে। এসব দিনের অভিজ্ঞতা খুব বিচিত্র হলেও বিস্তৃত বর্ণনা করবার দরকার নেই। যুদ্ধশেষ হবার পরে গ্রামে ফিরে গেলাম, কিন্তু বেশিদিন ভালোলাগল না। আবার একটা চাকরিতে ভর্তি হয়ে চলে গেলুম মেসোপটেমিয়া। তিন বছর পরে মেসোপটেমিয়া থেকে ফিরেবম্বে এলাম। হাতে তখন কিছু টাকা হয়েচে, ভাবলাম একটাট্যাক্সি গাড়ি কিনে বম্বে কি কলকাতার রাস্তায় চালাব। কিন্তুদু-তিন দিন পরে একটা সরাইখানায় জনকয়েক পাঠান গুন্ডার।সঙ্গে একটা ব্যাপার নিয়ে ঝগড়া বেধে ছুরি মারামারি হল।তাতে একজন পাঠান জখম হল। আমার সঙ্গে আমার এক বন্ধু ছিল। পুলিশের ভয়ে দুজনে রাতারাতি বম্বে ছেড়ে চম্পট দিলাম।

অনেক বাধাবিঘ্ন উত্তীর্ণ হয়ে দু-জনে আমরা কোয়েটা হয়ে মরুভূমির পথে কাবুল পৌঁছে গেলাম। তখন নতুন বাস ওলরি চলচে কাবুলে, অনেক বড়লোকের মোটর হয়েচে। কিন্তুভালো মোটর ড্রাইভারের সংখ্যা তত বেশি নয়। আমাদেরমোটর চালানোর কাজ পেতে দেরি হল না।

কয়েক বছর কেটে গেল। বেশ সুখেই আছি ! আগের পয়সা হাতে ছিল, সেই পয়সায় নিজে একটা লরি কিনে কাবুল-কান্দাহারের পথে চালাই। জিনিসপত্র সস্তা, অনেক বন্ধুবান্ধবও জুটে গেল, লরি চালিয়ে ক্রমশ উন্নতি হতে লাগল। কাবুলে ভোলানাথ বলে একজন লোক ছিল, বিখ্যাত লোক। সে জাতে গুজরাটি ব্রাহ্মণ,

অনেক দিন থেকে কাবুলে আছে। এখানে পুরুতের কাজ করে। মীরমক্‌দ্‌ বাজারের দক্ষিণে ছোটএকটা গলির মধ্যে তার একটা ছোট মন্দির আর বাড়ি।

ভোলানাথের মন্দিরটি এক অদ্ভুত জায়গা।

সন্ধ্যার পর থেকে নানা ধরনের লোক সেখানে এসে আড্ডা দিতে আরম্ভ করে। চা হরদম চলচে, মোটা কড়াতামাকের ধোঁয়ায় মন্দিরের চাতাল অন্ধকার হয়ে যায়।এদিকে ঘণ্টা বাজে, আরতি হয়, প্রসাদ বিতরণ হয়। রাত বারোটা-একটা পর্যন্ত লোকের পর লোক আসচে। তার মধ্যে খুব বড় প্রতিপত্তিশালী ব্যবসাদার থেকে আমার মতো বাজেলোকও আছে। আর সবারই ওপর ভোলানাথের প্রভাব খুববেশি। সবাই তাকে মানে, খাতির করে, তার কাছে পরামর্শনেয়।

একদিন রাত আটটার সময়ে ভোলানাথের মন্দিরেগিয়েচি।

চা পান শেষ হয়ে গিয়েচে। ভোলানাথ আমায় বললে—চাখাবে নাকি ?

বললাম-থাক, রাত হয়েচে, এখন আর চা খাবো না।

হঠাৎ আমার নজরে পড়ল দলের মধ্যে একজন আফগান রাজকর্মচারী বসে। আমি তাঁকে অনেকবার পথেঘাটে মোটর হাঁকিয়ে যেতে দেখেচি। অত বড় লোককে এখানে বসে থাকতে দেখে অবাক হয়ে গেলাম। কিন্তু মুখে কোনো কথা কাউকে বলা উচিত বিবেচনা না করে চুপ করে রইলাম।

একটু পরে আফগান অফিসারটি চলে গেলেন।

শুনলাম আমাদের মধ্যে কে কে মেশিনগান চালাতে জানে আফগান অফিসার তাই জিজ্ঞেস করতে এসেছিলেন।

ব্যাপার কি ?মেশিনগান কি হবে ?লড়াই কোথায় ?

অনেক রাত্রে উঠে আসছি, আমার এক বিশেষ বন্ধু জোয়ালাপ্রসাদ আমায় চুপি চুপি বললে—টাকাকড়ি যদি ব্যাঙ্কেথাকে, উঠিয়ে নাও এই বেলা—

—অবাক হয়ে বললাম—কেন, কি হয়েছে ?

—আমানুল্লার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ হবে শিগ্‌গির !

—কে বিদ্রোহ করবে ?

—আমার কাছে অত খবর তো পৌঁছয় নি। তুমি নিজেসাবধান হও, মিটে গেল। দু-একদিনের মধ্যে আগুন জ্বলবে।বেশি রাতে রাস্তায় চলাফেরা কোরো না।

মীরমক্‌দ্‌ বাজারের নীচ-শ্রেণির কাফিখানাগুলোতে তখনো আমোদ-প্রমোদ চলচে। এ সবগুলো ভয়ানক জায়গা রাতে। ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা থেকে জানি, বেখাপ্পায় ছোরারঘায়ে কত লোক যে প্রাণ হারিয়েচে তার ঠিকানা নেই।

বাজার ছাড়িয়েচি, এমন সময় হঠাৎ দূরে দুমদাম বন্দুকের আওয়াজ শোনা গেল। সঙ্গে সঙ্গে পট্‌-পট্‌-পট্‌-পট্‌ মেশিনগানের আওয়াজ।

বাচ্চা-ই-সাকোর বিদ্রোহ আরম্ভ হয়ে গেল।

মীরমক্‌দ্‌ বাজারের লোকজন হুড়হুড় করে দোকান কাফিখানা ছেড়ে বার হয়ে এল, কেউ কিছু জানে না, সবাইকান খাড়া করে শুনচে।...

বিদ্রোহ কথাটা কিন্তু শিগ্‌গির তুলোর আগুনেরমতো চারিদিকে ছড়িয়ে পড়ল। সবাই সন্ত্রস্ত, ভীত হয়েউঠল—বিদ্রোহ মানে খুন, মানে লুটপাট, মানে গৃহদাহ, মানেপৈশাচিক অরাজকতা ও নিষ্ঠুরতা। বিশেষত এই সব জায়গায়।

ঠিক তাই ঘটল। বাচ্চা-ই-সাকোর বিদ্রোহ যখন পুরোমাত্রায় চলেচে, তখনকার কথা সবই জানি, কিন্তু সে সবকথা বলব না। চোখের সামনে যে সব ব্যাপার দেখেচি, এতদিনপরেও সেকথা ভাবলে শরীর শিউরে ওঠে। মীরমক্‌দ্‌ বাজারে রক্তের স্রোত বইল। কে যে কাকে মারে তার ঠিকানা নেই কিছু। সুযোগ পেয়ে বদ্‌মাইশ খুনী গুণ্ডার দল মাথাচাড়া দিয়ে উঠেচে—বাচ্চা-ই-সাকোর সৈন্যরা করেচে রাজনৈতিক বিদ্রোহ। সুবিধা পেয়ে শহরের সাধারণ গুন্ডা ও দস্যুর দল দিন-দুপুরে খুন রাহাজানি শুরু করে দিলে। আরো কত কি করলে, তার আর উল্লেখ না করাই ভালো।

একদিন রাত্রে আমার বন্ধু জোয়ালাপ্রসাদ এসে আমায় বললে—চুপি চুপি উঠে এসো ভোলানাথের ডেরায়—কোনো কথা জিজ্ঞেস কোরো না।

মীরমক্‌দ্‌বাজার পার হবার সময়ে তার অন্ধকার চেহারা দেখে মনটা দমে গেল। ভোলানাথের মন্দিরে গিয়ে দেখিশিখ ও জাঠ যে-কজন ড্রাইভার কাবুলে উপস্থিত ছিল, সবাই জড়ো হয়েচে—জনদশেক সবসুদ্ধ। আর উপস্থিত আছেন সেই আফগান অফিসার আর তাঁর সঙ্গে আর একজন দীর্ঘকায় সুপুরুষ আফগান, সাহেবী পোশাক পরা। মন্দিরের অস্পষ্ট আলোয় ওদের মুখ ভালো দেখা যায় না।

আফগান সর্দার বললেন—তোমাদের মধ্যে কে কে এই রাত্রেই কাবুল থেকে কান্দাহারের পথে মোটর নিয়ে যেতেপারবে? সেখান থেকে কে কে বোম্বাই পৌঁছুতে পারবে ?

আমি তো অবাক। কোথায় কান্দাহার, আর কোথায়বোম্বাই ! তাছাড়া যাবার পথ কই ?

—বিদ্রোহীরা তো খাইবারের পথ আটকেচে। আপাতত কাবুল নদী পেরুনো যাবে কিনা সন্দেহ। কেন, কাকে নিয়েযেতে হবে ?

আফগান অফিসার বললেন—চামানের পথে কোয়েটা হয়ে বোম্বাই পৌঁছুতে হবে। দশখানা লরি চাই। প্রাইভেটমোটর দু-খানা থাকবে। তা চালাবার লোক চাই। যত টাকা চাওপাবে।

আমরা সবাই ঘাড় নাড়লুম। অসম্ভব চামানের পথে কোয়েটাহয়ে বোম্বাই ! এই ভীষণ দিনে !

আফগান অফিসারটি অনেকক্ষণ তর্কবিতর্ক করলেন, ভয়ও দেখালেন—কোনো ফল হল না।

এমন সময় সাহেবী পোশাক পরা সেই সুপুরুষ লোকটি অন্ধকারের মধ্যে থেকে বেরিয়ে এসে আমাদের সামনে দাঁড়িয়ে বললেন—কেন, তোমাদের আপত্তিটা কি?

আমার ডাইনে-বাঁয়ের দু-তিনজন শিখ ও জাঠ চমকে উঠেই আভূমি নত হয়ে সেলাম করলে। জোয়ালপ্রসাদ বিস্ময়ে কাঠ হয়ে কলেরপুতুলের মতো বলে উঠল—জাঁহাপনা !...আমিও তখন চিনলাম। কী সর্বনাশ। স্বয়ং রাজা আমানুল্লা ?

আমানুল্লা বললেন—শোনো। যা চাও তাই পাবে, আমারদশখানা লরি দরকার। কে কে রাজি আছ ?আমাকে বোম্বাইপৌঁছে দিতে হবে। বড় বিপদে পড়ে তোমাদের ডেকেচি।তোমাদের বিশ্বাস করতে পারি ?

আমরা সমস্বরে বলে উঠলুম—জান কবুল, হুজুরালি— আমরা তৈয়ার। হুকুম করুন কোথায় গাড়ি আনতে হবে ?

আমানুল্লা রিস্টওয়াচে সময় দেখে বললেন—একঘন্টারমধ্যে গাড়ি এইখানে নিয়ে এস। তারপর কোথায় যেতে হবে ইনি বলে দেবেন।

সেই রাত্রে দশখানা লরি ও দু-খানা প্রাইভেট মোটরচুপি চুপি কাবুল ছেড়ে কান্দাহারের পথে রওনা হল। চারখানা লরিতে বোঝাই হল শুধু টাকা—তামার চওড়া পাতে আঁটা কাঠের ভারী বাক্স বোঝাই নগদ টাকা। প্রাইভেট মোটর দু-খানায় রাজা, রানি, ছেলেমেয়ে। সামনে পেছনে দু-খানা লরিতে তেরপল চাপা মেশিনগান।

শেষ রাত্রে কুয়াশার মধ্যে কাবুলের নিঃশব্দ রাজপথদিয়ে দেশের রাজা-রানিকে নিয়ে আমরা তীরের বেগে গাড়ি উড়িয়ে দিলাম।

কাবুল নদী পেরিয়ে ছোট পাহাড়ের ওপর বিদ্রোহীদের একটা ঘাঁটি। এতগুলো গাড়ি গেলে নিশ্চয়ই ওরা সন্দেহ করে পথ আটকাবে। জাঠ পুরণমল মেশিনগানের পেছনে তৈরিহয়ে বসল। আমরা কি করব ভাবচি—স্বয়ং আমানুল্লা হুকুম দিলেন কেটে বেরিয়ে চলো—

গম্বুজের কাছে ওরা অনেকে জড়ো হয়েচে দূর থেকে দেখতে পাচ্চি। আমরা অ্যাকসিল্যারেটারে পা দিয়ে সজোরে চাপলাম—চালাও ! হু-হু করে স্পীডোমিটারে ত্রিশ মাইল থেকে ঠেলে উঠল চল্লিশ...পঞ্চাশ—চক্ষেরনিমেষে ওদের ঘাঁটিটা একটা রাঙা কালো আবছায়ার মতো পাশ দিয়ে উড়ে বেরিয়েগেল—দুমদাম রাইফেল চললো..পট্‌পট্‌ মেসিনগান উত্তর দিলে আমাদের দিক থেকে। একখানা টাকা বোঝাই লরিরটায়ার ফেটে অচল হয়ে পড়ল। রইল সেটা পড়ে—কেউ তারদিকে চাইলাম না।

পেছনে ওরা এবার তাড়া করবে নিশ্চয়ই। আমাদেরসময় ছিল না। কান্দাহারের খবর পেলাম, কোয়েটা যাবারপথ বিদ্রোহীরা আটকেছে। ঘুরে হেলমন্দ নদী পার হয়েদক্ষিণ পশ্চিম কোণে আমরা আফগানিস্থানের সীমানা পার হই। তারপর বেলুচিস্তানের দুর্গম মরুভূমি...কালো কালো গাছপালাহীন পাহাড় আর কটা বালির মরুভূমি—মরুভূমি আরপাহাড়।

এই মরুভূমির মধ্যে কালাত থেকে চামানের পথেবেলুচ দস্যুরা আমাদের আক্রমণ করলে, ভাবলে লরি বোঝাই সওদাগরি মাল যাচ্ছে। মেশিনগান খেয়ে হটে গেল। একবারজল গেল ফুরিয়ে। এঞ্জিনের ট্যাঙ্কের গরম জল রাজা-রানিকেখেতে দিলাম নিজেদের বঞ্চিত করে। হয়তো সেবার সবসুদ্ধমরতে হোত মরুভূমির মধ্যে, কারণ ঠিক সেই সময় বেজায়বালির ঝড় উঠলো। রাস্তা নেই, দিক মুছে গেল, তার ওপরমুশকিল একখানা সেলুন গাড়ির এঞ্জিন অকর্মণ্য হয়ে পড়ল, কি যে সেটার ঘটল, কিছুতেই আমরা তা ধরতে পারলাম না। বাকি গাড়িখানায় ওই গাড়ির ছেলেমেয়েদের তুলে দিলাম—সেই ভীষণ গরমে, তৃষ্ণায় আর ঠাসাঠাসিতে তাদেরকি কষ্ট ! একেবারে নেতিয়ে পড়ল গাড়ির মধ্যে। আমানুল্লানেমে এসে লরিতে ড্রাইভারের পাশে বসলেন। সৌভাগ্যক্রমে ঘণ্টা-দুইয়ের মধ্যে কালাত থেকে করাচীগামী গভর্নমেন্টের ডাকমোটরের সঙ্গে আমাদের দেখা হল। ডাক পাহারা দেবার জন্যে সঙ্গে একখানা সাঁজোয়া গাড়ি, কারণ ঐ সময়টা বেলুচদস্যুদের বড় উৎপাত চলছিল মরুভূমির পথে। একদিনে চামান, পরদিন দুপুরে করাচী। ঠিক হল সেখান থেকে ট্রেনেরাজা-রানি বম্বেতে যাবেন। আমরা ফিরলাম সেই দিনেই কাবুলে। জনপিছু দুশো টাকা বকশিশ মিললো, গাড়িভাড়া ওতেলের দাম বাদে। বিদায় নেবার সময় আমানুল্লা আমাদের প্রত্যেকের সঙ্গে করমর্দন করলেন। বললেন—যদি কখনোফিরি, তোমাদের ভুলব না। চেয়ে দেখি রানিমার চোখে জল। আমাদেরও কারো চোখ সে সময় শুষ্ক ছিল না, বোধ হয় কঠোরপ্রান দুর্ধর্ষ জাঠ পূরণমলেরও না—নইলে সে অন্যদিকেমুখ ফিরিয়ে ছিল কেন ?